Contents

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইনসানে কামেল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-২৭
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الإنسان الكامل

تأليف : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
ছফর ১৪৩০ হি./ মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খ্রি.
২য় সংস্করণ
জুমাদাল ঊলা ১৪৩৭ হি./ফাল্গুন ১৪২২ বাং/মার্চ ২০১৬ খ্রি.

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

INSANE KAMEL by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**, Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. Mob: 01770-800900.

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

এক রজনীর উপহার 'ইনসানে কামেল'

নওগাঁ জেলে মাননীয় লেখকের কারাসাথী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মেহেরপুর যেলার গাংনী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম স্বীয় কারাস্মৃতিতে বলেন,

'মুহতারাম আমীরে জামা'আত একদিন বিকালে আমাকে ডাকলেন। সে সময় আমরা সেলের আঙিনায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'নূরুল ইসলাম! সরকারের যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের সহজে ছাড়বে না। আমাদের কর্মী, শুভাকাংখী ও সাধারণ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আমাদের কিছু নছীহত থাকা দরকার। আমি স্যারের কথা সমর্থন করে বললাম, আমাদের নেতা-কর্মীদের কার্যকর দিক-নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই লকআপ-এর ঘণ্টা পড়ে গেছে। ফলে আমীরে জামা'আতের রাতের খাবার তাঁর কক্ষে ঢেকে রেখে আমরা তিনজন পাশেই আমাদের রুমে চলে গেলাম। ...পরদিন ফজরের ছালাতের পর লকআপ খুললে স্যারের রুমে গিয়ে দেখি রাতের খাবার যেভাবে ঢেকে রেখেছিলাম সেভাবেই আছে। বললাম, স্যার একি অবস্থা? বললেন, খাওয়ার কথা মনেই নেই। তোমরা শোন, এই আমার নছীহত। নছীহতনামাটি আযীযুল্লাহ পড়তে লাগল, আমরা শুনলাম। স্যার মাঝে-মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন। কি চমৎকার উপদেশমালা! 'ইনসানে কামেল' নামে এক রাতেই শেষ করা তাঁর এই লেখাটিকে আমরা আল্লাহ্র রহমত হিসাবে গ্রহণ করলাম। স্যার বললেন, লেখাটি খুব সাবধানে মারকাযে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। ওরা রেফারেন্সগুলো দিয়ে দিবে'।

পরে লেখাটি মাসিক 'আত-তাহরীক' ৯ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর'০৫ পরপর দু'সংখ্যায় বের হয়। আরও পরে ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে সেটি ৩২ পৃষ্ঠার বই আকারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশ করে *(কারাস্মৃতি ৬৫-৬৬ পৃ.)*।

দীর্ঘ সময় পরে মাননীয় লেখকের পুনরায় দেখা ও সংশোধনীর মাধ্যমে বইটির ২য় সংস্করণ বের করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ইনসানে কামেল

প্রত্যেক মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবধর্ম তথা ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে সর্বদা তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যের প্রবণতা মওজূদ থাকে। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় সে প্রায়শঃ বিপথে যায় এবং আল্লাহকে ভুলে শয়তানের গোলাম বনে যায়। আবার কখনো সে শয়তানের গোলামী ছেড়ে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরে আসে। এভাবে পৃথিবীর মানুষ মুমিন ও কাফির দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। কাফির-ফাসিকগণ শয়তানের তাবেদারী করে ও মুমিন-মুসলিমগণ আল্লাহ্র দাসত্ব করে। শয়তানের গোলামেরা পৃথিবীকে অশান্তির অগ্নিকুণ্ড বানায়। আর আল্লাহ্র গোলামেরা সমাজকে শান্তির কুঞ্জে পরিণত করে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেখা দেয় সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিত্র। ফাসিক-মুনাফিকরা হয় দুনিয়া পূজারী আর মুমিন-মুসলিমরা হন আখেরাতের পিয়াসী। কাফির-মুনাফিকরা দুনিয়াকে লুটে-পুটে খায়। আর মুমিন-মুসলিমরা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে। কাফির-ফাসিকরা প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পক্ষান্তরে মুমিন পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অহং-অহমিকা সবকিছুকে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের সামনে সমর্পণ করে দেয়। তার পশুপ্রবৃত্তি পরাজিত হয়। মানবতা পূর্ণতার শিখরে উন্নীত হয়। এভাবে 'ইসলাম' মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। শয়তানের গোলামী ছেড়ে সে আল্লাহ্র গোলামে পরিণত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে 'ইনসানে কামেল' বা পূর্ণ মানুষে উন্নীত হয়। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- (البقرة ২০৮-২০৯)-

অনুবাদ : 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন'। 'আর তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এসে যাওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহ'লে জেনে রেখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২০৮-০৯)*।

শানে নুযূল : ইকরিমা ধারণা করেন যে, ছা'লাবাহ ও আসাদ বিন উবায়েদ সহ ইহূদীদের একদল বিদ্বান সম্পর্কে অত্র আয়াত নাযিল হয়। যারা ইসলাম গ্রহণের পরেও আগের ধর্ম অনুযায়ী শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করার এবং রাতের বেলায় তাওরাত পাঠ করার অনুমতি চেয়েছিলেন'।[১] অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর অন্য ধর্মের বা মতাদর্শের কোনকিছুই আর মানা চলবে না। কেননা ইসলাম হ'ল সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এতে কোনরূপ সংযোজন বা বিয়োজন নেই। 'ইসলাম' আসার পর বিগত সকল এলাহী ধর্ম 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত বলে গণ্য হবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল দল-মতের মানুষকে এই সর্বশেষ এলাহী দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে যেতে হবে।

বলা আবশ্যক যে, বর্তমান যুগে ইহূদী বা খ্রিষ্টান ধর্ম বলে যা চালু আছে, তা ধর্মযাজকদের তৈরী বিকৃত ধর্ম। মূল তাওরাৎ বা ইঞ্জীলের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই।

ব্যাখ্যা : মানুষকে আল্লাহ পাক সর্বোত্তম প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। দৈহিক অবয়বে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে সে সকল সৃষ্টির সেরা। একটি স্বাভাবিক স্তর পর্যন্ত সকল মানুষ সমান হ'লেও জ্ঞান ও মানবিক গুণাবলীর কমবেশীর কারণে তাদের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার স্তরভেদ। এমনও মানুষ রয়েছে, যাদের হৃদয় থাকা সত্ত্বেও তারা বুঝে না, কান থাকতেও শোনে না, চোখ থাকতেও দেখে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। আবার এমন মানুষ রয়েছেন, যারা সৃষ্টির সেবায় জীবনপাত করেন, সর্বোচ্চ জ্ঞান সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দেন, সবকিছু ত্যাগের মধ্যেই আনন্দ পান, অন্যের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য নিজের হাসি বিসর্জন দেন। বিনিময়ে তাঁরা কিছুই চান না। এমন মানুষের সংখ্যা কম হ'লেও

১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২০৮ আয়াত।

এঁরাই দুনিয়ার সেরা মানুষ। এঁরাই মানবতার পূর্ণরূপ বা 'ইনসানে কামেল'। এঁদের কারণেই পৃথিবী আজও টিকে আছে।

প্রত্যেক মানুষই চায় 'ইনসানে কামেল' হ'তে। কিন্তু কিভাবে হবে, তা তার জানা নেই। তাই যুগে যুগে লোকেরা স্ব স্ব জ্ঞান মোতাবেক এক একটা মতাদর্শ রচনা করে তার অনুসরণে ব্যাপৃত হয়েছে। এভাবেই পৃথিবীতে এযাবৎ রচিত হয়েছে প্রায় আড়াই শতাধিক ধর্ম। কিন্তু কোন ধর্মেই চূড়ান্ত সান্ত্বনা না পেয়ে আজকাল অনেক পণ্ডিত বলেছেন, প্রকৃত ধর্ম হ'ল 'মানব ধর্ম'। মানব ধর্মের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণেই কেবল পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কল্পিত সেই মানবধর্মের পরিচয় কি? তখন আঁধার হাতড়িয়ে হয়ত কেউ বলেন, এটা যার যার জ্ঞান মোতাবেক। দেখা যাবে যে, এর সার কথা হ'ল 'শূন্য'।

দেড় হাযার বছর পূর্বে শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলে গিয়েছেন, 'প্রত্যেক মানব সন্তানই ফিৎরাত বা স্বভাবধর্মের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, নাছারা বা অগ্নি উপাসক বানায়'।[২] এতে বুঝা যায় যে, স্বভাবধর্ম বা মানবধর্ম হ'ল মানুষের স্বাভাবিক স্তর। একে সমুন্নত করার জন্য লাগে একটি উন্নত পরিকল্পনা এবং একটি নিখুঁত ও বাস্তব সম্মত রূপরেখা বা কর্মসূচী। যেমন খনিতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেটাকে অলংকারে রূপান্তরিত করার জন্য লাগে উন্নত কলা-কৌশল ও সর্বোত্তম প্রযুক্তি এবং সর্বোপরি কুশলী কারিগর। কে হবে সেই কারিগর? স্বর্ণ কি নিজেই নিজের কারিগর হ'তে পারে? অনুরূপভাবে মানুষ কি নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা হ'তে পারে? মানুষকে আল্লাহ স্বর্ণপিণ্ডের ন্যায় জড়পদার্থ করে সৃষ্টি করেননি। বরং তাকে দিয়েছেন অতুলনীয় জ্ঞান সম্পদ। আর সেকারণেই সে অন্য সকল সৃষ্টির চাইতে সেরা। কিন্তু তার এই জ্ঞান কি পূর্ণাঙ্গ? সে কি তার ভবিষ্যৎ বলতে পারে? কোন্ কাজের পরিণাম কি হ'তে পারে, সে কেবল অনুমান করতে পারে। কিন্তু সে কি নিশ্চিত বলতে পারে? না। আল্লাহ বলেন,

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ–

২. বুখারী হা/১৩৫৮; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়।

'তুমি বল, যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ'লে আমি অধিক কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না। আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী মাত্র' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*।

ফলকথা, মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে নিজেকে সুন্দর মানুষ হিসাবে, 'ইনসানে কামেল' হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেও এক পর্যায়ে সে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির কাছে সে পরাভূত হয়। যাদেরকে সে আদর্শ ভেবে অনুসরণ করে, সেখানেও দেখতে পায় নানা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা। ফলে সে হতাশ হয়ে পড়ে ও এক সময় বলে ওঠে 'আনাল হাক্ব' (أَنَا الْحَقُّ)।[৩] 'আমিই পরম সত্য' আমিই আল্লাহ'। সে বলে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' (কবি চণ্ডিদাস)। সে যে কারু দ্বারা সৃষ্ট, একথা সে ভুলে যায়। ফলে অহংকারে মত্ত হয়ে সে এক সময় নাস্তিক হয়ে যায়।

স্বর্ণের কারিগর যেমন জানে কিভাবে স্বর্ণকে অলংকারে পরিণত করতে হয়, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তেমনি জানেন কিভাবে মানুষকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে হয়। তিনি সেপথ কেবল বাৎলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঠিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা উত্তম নমুনা হিসাবে অনুসরণ করার জন্য পরবর্তী মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন *(আহযাব ৩৩/২১)*।

আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। অত্র আয়াতে 'ইনসানে কামেল' হওয়ার জন্য ইসলামের হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সমূহ মেনে তার মধ্যে পূর্ণরূপে দাখিল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে উক্ত পথের বাধা হিসাবে শয়তান নির্দেশিত অন্ধকার গলিপথ সমূহে প্রবেশ করতে

---

৩. এটি নকশবন্দীয়া তরীকার ছূফী মনছূর হাল্লাজের (২৪৪-৩০৯ হি./৮৫৮-৯২২ খৃ.) কুফরী উক্তি। যার অর্থ 'আমিই পরম সত্য' আমিই আল্লাহ। উক্ত কুফরী দর্শন প্রচারের শাস্তি স্বরূপ বহু বছর কারাদণ্ড ভোগের পর বাগদাদে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় *(তারীখু বাগদাদ ৮/৭০৫)*।

নিষেধ করা হয়েছে। আদেশ ও নিষেধ একই আয়াতে বলে দেওয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলোর পথের পথিকদেরকে অন্ধকার গলিপথে টেনে নেওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা লোভ ও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসে থাকবে। 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর অনুসারীকে তাই সর্বদা ইসলামরূপী গাইডের দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। নইলে উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা আঁকা-বাঁকা পথের আতংকিত যাত্রীদের ন্যায় যেকোন মুহূর্তে পিছলে পড়ে সাক্ষাৎ ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই যে, বিশ্বাসীগণ যেন তাদের বিশ্বাস ও কর্ম উভয় জগতে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে। তার মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা, চোখ-কান সবই যেন ইসলামের আওতায় ও আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে পরিচালিত হয়। যদি কারু হাত-পা সাময়িক কোন কারণে ইসলামের অবাধ্যতা করে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক ইসলামের প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকে এবং খালেছ অন্তরে তওবা করে, তাহ'লে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হ'তে পারে। পক্ষান্তরে যদি কারু হাত-পা বাধ্য থাকে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক অবাধ্য থাকে, তবে সে হবে 'মুনাফিক'। তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আর যে ব্যক্তি ইসলামের নির্দেশনা গ্রহণ ও তা মান্য করতে অস্বীকার করবে, সে হবে 'কাফির'। সে পদস্খলিত হবে এবং জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। তাছাড়া এ আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সকল বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা সমূহ মওজূদ রয়েছে। অতঃপর সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে অত্র আয়াতের প্রতিপাদ্য দাঁড়াচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ ইসলামের বিশ্বাসগত ও কর্মগত সকল বিষয়কে আন্তরিকভাবে কবুল না করবে এবং তাতে পূর্ণভাবে আমল না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত অর্থে 'মুসলিম' পদবাচ্য হ'তে পারবে না এবং পরিপূর্ণ মানুষ বা 'ইনসানে কামেল' হ'তে পারবে না।

মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় উপাদান মওজূদ রয়েছে। তার ভাল-কে সর্বোত্তম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া ও সেভাবে ধরে রাখার জন্যই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি যত উত্তম রূপে উক্ত বিধান অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি তত পূর্ণাঙ্গ মানুষ

হিসাবে পরিগণিত হবে। এজন্য তাকে আমৃত্যু উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করতে হবে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মও মানুষকে ভাল-র প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সেগুলি মানুষের রচিত বিধায় সেসবের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। ভাল মনে করা হ'লেও প্রকৃত অর্থে তা ভাল নয়, এমন অসংখ্য বিধান ঐসব ধর্মে রয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মে 'সতীদাহ' প্রথাকে ধর্ম মনে করা হয়। ধর্মের নামে নারীদেরকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। একইভাবে বিধবা মহিলাদের পুনরায় বিবাহ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। যদিও রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রতিককালে তাদের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার এসেছে। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে কট্টর হিন্দুরা তা আজও মেনে নিতে পারেনি। বিধবা বিবাহ চালু করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিকে তার সমাজের কাছ থেকে কি নিগ্রহ পোহাতে হয়েছে, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তা জানেন। খ্রিষ্টান ধর্মেও রয়েছে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ। যেমন তাদের ধর্মযাজকদের চিরকুমার থাকাটাকেই ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ এই ধর্মীয় বিধান মান্য করতে গিয়ে, যেনা-ব্যভিচার ছাড়াও শিশু ধর্ষণের মত নোংরামিতেও আমেরিকান ধর্মযাজকদের জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত সূদখোরী, মদ্যপান, শূকরের গোশত ভক্ষণ এখনো তাদের নিকটে ধর্মীয়ভাবে সিদ্ধ। অথচ এগুলির কোনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভাল নয়। বরং নিঃসন্দেহে মন্দ ও সর্বতোভাবে অকল্যাণকর।

মানবজাতি দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত

পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে তার বিশ্বাস ও কর্মের হিসাবে দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছে- মুমিন ও কাফির *(তাগাবুন ৬৪/২)*। এতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য উপাদান থাকলেও জাতি গঠনের মূল উপাদান হ'ল 'ধর্ম'। পিতা আদম *(আলাইহিস সালাম)* ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। তাঁর সময়ে পৃথিবীর মানুষ একটি মাত্র ধর্মে অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসী একক উম্মত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পরিচালনার জন্য কিতাব সহকারে যুগে যুগে নবীগণকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের যিদ ও হঠকারিতা বশতঃ অহি-র বিধানসমূহের ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল এবং সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়েছিল' *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

এতে প্রমাণিত হয় যে, যুগে যুগে নবীগণ মানবজাতিকে আল্লাহ্তে বিশ্বাসী একক জাতীয়তার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু হঠকারী লোকেরা সে

আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল প্রভৃতির পার্থক্যের অজুহাতে বিভিন্ন জাতীয়তা সৃষ্টি করে মানবজাতিকে বিভক্ত করেছে ও নিজস্ব শাসনের নামে শয়তানী শোষণ ও নির্যাতন ব্যবস্থা চালু করেছে। বর্তমানের বিভক্ত বিশ্ব তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। মহাকবি ইকবাল অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তাঁর 'জওয়াবে শিকওয়াহ্'র মধ্যে-

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بہی نہیں

جذب باہم جو نہیں محفل انجم بہی نہیں

'ধর্মে হয় জাতি গঠন, ধর্ম নেই তো তুমি নেই

নেই যদি মাধ্যাকর্ষণ, তারকারাজির সমাবেশ নেই'।[৪]

রাজনীতিবিদগণ মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, বাস্তবে সেটাই হয়েছে এবং হচ্ছে।

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পৃথিবীর একমাত্র ইহূদী রাষ্ট্র (?) ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের পিছনে প্রধানতঃ একটি বিষয়ই কাজ করেছিল- সেটি হ'ল, আহলে কিতাব হওয়ার দাবীদার হিসাবে ইহূদীদের সাথে তাদের ধর্মীয় ঐক্য এবং তাদের বিরোধী হিসাবে মুসলিম বিদ্বেষ। ফিলিস্তীনের হাযার বছরের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদেরকে নির্বিবাদে হত্যা, লুণ্ঠন ও বিতাড়িত করতে তাদের গণতন্ত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতায় ও মানবাধিকারে মোটেই বাঁধেনি। একইভাবে প্রায় ৮০০ বছরের স্পেনীয় মুসলিম খেলাফতকে তারা ধ্বংস করেছে ন্যাক্কারজনক প্রতারণার মাধ্যমে। ইউরোপের বুকে অবশিষ্ট একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়াকেও তারা কয়েক বছর আগে শেষ করে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি তারা মিথ্যা অজুহাতে আফগানিস্তান ও ইরাককে কব্জা করে নিয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ 'পূর্ব তিমুরকে' বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। কয়েক বছর ধরে সেখানে ত্রাণ সাহায্যের মুখোশে ধর্ম প্রচার করে খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ

৪. ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ.), শিকওয়াহ্ ও জওয়াবে শিকওয়াহ্ (উর্দূ ব্যাখ্যাসহ) ৫৯ পৃ.।

বানিয়ে তাদেরকে দিয়ে সেটিকে পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে ইন্দোনেশিয়া থেকে ছিনিয়ে নিল ঐ ইঙ্গ-মার্কিন খ্রিষ্টান চক্র। একইভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ হিসাবে পরিচিত ভারত ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘ প্রস্তাবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা কাশ্মীরকে কব্জা করে নিল সেখানকার জনমতের বিরুদ্ধে। আজও সেখানে লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন করে দৈনিক তাদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন চক্র এক্ষেত্রে ভারতকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে কম্যুনিষ্ট বিশ্বও। এসব করার জন্য তাদের বহু ঘোষিত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মানবাধিকারবাদ কোনরূপ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

অতএব আল্লাহ্র বাণীই সঠিক। বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত মুসলিম ও কাফির। বিশ্ব মুসলিম যদি কখনো পূর্বের ন্যায় একই ইসলামী খেলাফতভুক্ত হয় এবং পূর্ণ ঈমানী শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে, তাহ'লে সেই শক্তিই হবে বিশ্বের সেরা শক্তি। যে শক্তিকে ছলে-বলে কৌশলে ধ্বংস করেছে এই আন্তর্জাতিক খৃষ্টবাদী চক্র বিগত ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কের কামাল পাশাদের হাত দিয়ে তথাকথিত গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সুড়সুড়ি দিয়ে।

প্রশ্ন হ'ল- আল্লাহ্র বিধান যখন সকলের কল্যাণের জন্য, তখন কাফেররা তার বিরোধিতা করে কেন? এর জবাব এই যে, কাফেররা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চায়। ঈমানের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে তারা পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ চান তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষ পৃথিবীতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করুক। কাফেররা ও তাদের সমমনা মুনাফিক, ফাসিক ও প্রবৃত্তি পূজারী লোকেরা যুগে যুগে আল্লাহ প্রেরিত কিতাব ও নবীদের বিরোধিতা করেছে। আজও করে চলেছে। নবী ও মুমিনগণ তাদের উপরে আপতিত কুফরী নির্যাতনকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে মুকাবিলা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য নছীহতের মাধ্যমে, জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে তাঁরা আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। কখনো আত্মরক্ষার স্বার্থে সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে অবতরণ করেছেন। এভাবেই পৃথিবীতে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে।

ইনসানে কামেল-এর বৈশিষ্ট্য

একজন মানুষের মধ্যে যখন তিনটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে বিকশিত হবে, তখনই তাকে 'ইনসানে কামেল' বলা যাবে। হাক্কুন নাফ্স, হাক্কুল ইবাদ ও হাক্কুল্লাহ।

(১) হাক্কুন নাফ্স (حق النفس) : 'হাক্কুন নাফ্স' বা নফ্সের হক হ'ল প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যথাযথভাবে রক্ষা করা। বিয়ে-শাদী, পরিবার পালন, অর্থোপার্জন ইত্যাদি সবকিছু এর মধ্যে পড়ে। তবে এগুলো হ'ল নফসের বাহ্যিক দিক। পক্ষান্তরে নিজেকে সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, সচ্চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু হিসাবে গড়ে তোলা, সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকা ও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা, এগুলো হ'ল নফসের আভ্যন্তরীণ দিক। এই আভ্যন্তরীণ বা রূহানী শক্তি অর্জন না করা ব্যতীত কেউ তার নফসের হক পুরোপুরি আদায়ে সক্ষম হবে না।

(২) হাক্কুল ইবাদ (حق العباد) : নফ্সের হক মানুষ যত সুন্দরভাবেই আদায় করুক না কেন, নিজের মধ্যে চারিত্রিক উন্নতি যতই ঘটুক না কেন, যতক্ষণ না সে অন্য মানুষের হক-এর প্রতি মনোনিবেশ করবে, ততক্ষণ সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হ'তে পারবে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِّسَانِهِ وَيَدِهِ.. 'মুসলমান সেই, যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে'।[৫] তিনি আরও বলেন, فَإِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম'।[৬]

উক্ত তিনটি প্রধান বস্তু উল্লেখ করে অন্য সকল ছোটখাট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, কলার খোসা বা অনুরূপ কোন বস্তু রাস্তার উপরে না ফেলা, নিজ গৃহ ও বাথরুম পরিচ্ছন্ন রাখা, মজলিসে কেউ এলে তার সঙ্গে হাসিমুখে সালাম-মুছাফাহা ও কুশল বিনিময় করা, তার জন্য স্থান করে দেওয়া, মজলিসে খাওয়ার

৫. বুখারী হা/১০; মুসলিম হা/৪০; মিশকাত হা/৬; আহমাদ হা/২৪০০৪; ছহীহাহ হা/৫৪৯।
৬. বুখারী হা/১৭৩৯, মুসলিম হা/১৬৭৯, মিশকাত হা/২৬৫৯।

Contents

সময় তার আদব রক্ষা করা, বিনা অনুমতিতে কারু গৃহে বা অফিসে প্রবেশ না করা, মেযবানের বাড়ীতে অধিক দিন অবস্থান না করা, রোগীকে দেখতে গিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান না করা, অন্যের ইবাদত, লেখাপড়া বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এমন কাজ না করা, জামা'আতে বা জুম'আর দিনে গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে মসজিদে যাওয়া, যাতে অন্য মুছল্লী প্রীত হয়। এক কথায় মানুষকে কষ্ট দানকারী সকল কাজ হ'তে বিরত থাকা 'হাক্কুল ইবাদ' রক্ষা করার মধ্যে শামিল।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে দু'জন মহিলার কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদের একজন অধিকহারে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করত এবং ছাদাক্বা প্রদান করত। কিন্তু সে তার যবান দ্বারা প্রতিবেশীদের কষ্ট দিত। অন্যজন কিছু কম করত। কিন্তু প্রতিবেশীকে যবান দ্বারা কষ্ট দিত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমোক্ত মহিলাকে জাহান্নামী ও দ্বিতীয় মহিলাকে জান্নাতী বললেন।[৭] অন্য একটি হাদীছে পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়াকে ছিয়াম, ছাদাক্বাহ, এমনকি ছালাতের চাইতে উত্তম বলা হয়েছে।[৮] এতে বুঝা যায় যে, হাক্কুল ইবাদ আদায় করা নফল ইবাদতের চাইতে উত্তম কাজ। অতএব অন্যের অধিকার খর্ব হ'তে পারে এরূপ অতি ক্ষুদ্র কাজ হ'তেও বিরত থাকা কর্তব্য। কোন ছোটখাট যুলুমকে মোটেই ছোট মনে করা উচিত নয়। কেননা দিয়াশলাইয়ের একটি ছোট্ট কাঠি থেকেই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকে। যুলুম হ'ল সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। যার সর্বোচ্চ স্তর হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করা *(লোকমান ৩১/১৩)*।

বহুল প্রচলিত কিছু যুলুম :

(১) শরীক ফাঁকি দেওয়া। বিশেষ করে মেয়ে বা বোনদেরকে এবং ছোট ভাইদেরকে তাদের পিতার সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা।

(২) নিজ পরিবার ও সন্তানদের হক যথাযথভাবে আদায় না করা। অনেকে এগুলোকে গৌণ মনে করেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনতের নাম করে দেশান্তরী হন। অথচ তিনি বুঝেন না যে, আল্লাহ্র রাস্তা তার বাড়ীর

---

৭. আহমাদ হা/৯৬৭৩; ছহীহাহ হা/১৯০; মিশকাত হা/৪৯৯২ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়।
৮. তিরমিযী হা/২৫০৯, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/৪৯১৯; মিশকাত হা/৫০৩৮।

আঙিনাতেই ছিল। এগুলোকে ধর্ম মনে করে বরং শয়তানী ধোঁকায় পা দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

(৩) স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না করা এবং স্বামীর মৃত্যুর সময় সেটা মাফ করিয়ে নেওয়া।

(৪) অনেক দ্বীনদার স্বামী ছওয়াবের আশায় তার উপার্জনের সবটাই তার পিতা-মাতার হাতে তুলে দেন, স্ত্রীর হাতে কিছুই দেন না। অথচ গৃহকর্ত্রী হিসাবে স্ত্রীর হাতে সর্বদা কিছু অর্থ থাকা উচিত। যাতে তিনি ইচ্ছামত কিছু খরচ করতে পারেন। তাছাড়া স্বামীর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার মধ্যেও একটা গভীর আনন্দ আছে। যা থেকে অনেক স্বামী তাদেরকে বঞ্চিত করেন। এতে স্ত্রী নিঃসন্দেহে মনোকষ্টে থাকেন। এতে স্বামী গোনাহগার হবেন।

(৫) এর বিপরীতে অনেক বিবাহিত ছেলে তার পিতা-মাতার খোঁজ-খবর নেয় না। তাদের হাতে কোন পয়সা-কড়ি দেয় না। উপার্জনের সবটুকু এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। ফলে পিতা-মাতাকে ছেলের স্ত্রীর মুখাপেক্ষীতে পরিণত করা হয়। এতে পিতা-মাতা মনে কষ্ট পান। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। নইলে পিতা-মাতার দীর্ঘ নিঃশ্বাস আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়ে গেলে সন্তানের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

(৬) অনেক শ্বাশুড়ী তার পুত্রবধুর উপরে যুলুম করেন। পুত্রবধুর সুখ-দুঃখের প্রতি শ্বশুর-শ্বাশুড়ী খেয়াল করেন না, কেবল নিজেদের সেবা-যত্নের ত্রুটি ধরায় ব্যস্ত থাকেন। এসব ক্ষেত্রে অন্য কোন অসুবিধা না থাকলে বিবাহিত ছেলেদের আলাদা সংসার করার অনুমতি দেওয়া উচিত। তবে বাপ-মা অসহায় ও বৃদ্ধাবস্থায় থাকলে তাঁদেরকে নিজ সংসারে পূর্ণ মর্যাদা ও যত্নের সাথে রাখতে হবে।

(৭) সমাজে একটা ধারণা চালু হয়ে গেছে যে, মেয়েরা তাদের পিতৃ সম্পত্তির অংশ বুঝে নিলে ভাইদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা ও অন্যায় রীতি। বোনেরা এসে ভাইদের সঙ্গে বা ছোট ভাইয়েরা বড় ভাইয়ের সঙ্গে শরীকানা অংশ নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করার আগেই যদি তাদের হক তাদের বুঝে দেওয়া হয়, তাহ'লে তো আর ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। অনেক সময় দেখা যায়, বোনেরা শ্বশুরবাড়ীতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছে, অথচ তারই প্রাপ্য

পিতৃ সম্পত্তি ভোগ করে ভাইয়েরা ধনের বড়াই করছে। অথচ হাদীছে এসেছে, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ '(শরীক ফাঁকি দিয়ে বা অন্যায়ভাবে) কারু এক বিঘত মাটিও যদি কেউ যুলুম করে ভোগ করে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ীরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ '...তাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা মাথায় বহন করে চলতে বাধ্য করা হবে'।[১০]

(৮) রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল ও শ্রদ্ধাশীল থাকাটাই হ'ল 'আদব'। এর বিপরীত করাটা 'যুলুম'। কিন্তু নেতা যদি কারু উপরে যুলুম করেন, তবে তার শাস্তি হবে সর্বাধিক। ক্বিয়ামতের দিন যালেম ও খেয়ানতকারী নেতাদের কোমরে একটা করে খেয়ানতের ঝাণ্ডা গেড়ে দেওয়া হবে, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়।[১১] গণতন্ত্রের নামে বর্তমান দলতন্ত্রে নেতৃত্ব বিভক্ত হওয়ার কারণে সুযোগসন্ধানী ও নেতৃত্ব লোভীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারী ও বিরোধী দলের পারস্পরিক হানাহানিতে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জোট সরকার হওয়ার কারণে এখন যুলুমের পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে। কেননা অনেক সময় জোট ঠিক রাখার জন্য শরীকদের অন্যায় আবদার বড় দলকে রক্ষা করতে হয়। ফলে রাষ্ট্র এখন ক্রমেই যালিমের প্রতিমূর্তিতে আবির্ভূত হচ্ছে। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' নামে একটি পরিভাষা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। যা আগে কারু জানা ছিল না। পৃথিবী ক্রমেই যুলুমের হুতাশনে পরিণত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘনঅন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'।[১২] অতএব যালেম শাসক ও নেতাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি অপেক্ষা করছে। মূলতঃ হাক্কুল ইবাদ নষ্ট

---

৯. বুখারী হা/৩১৯৮, মুসলিম হা/১৬১০, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।

১০. আহমাদ হা/১৭৫৯৪; মিশকাত হা/২৯৫৯, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৪২।

১১. মুসলিম হা/১৭৩৮, মিশকাত হা/৩৭২৭ 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়।

১২. বুখারী হা/৪৪১৯, মুসলিম হা/২৯৮০, মিশকাত হা/৫১২৫।

করাই হ'ল যুলুমের প্রধান কারণ। অতএব সর্বদা এ হকের প্রতি সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(৩) হাক্কুল্লাহ (حق الله) : 'হাক্কুল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র হক। বান্দার নিকটে আল্লাহ্র হক হ'ল তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আল্লাহ্র ইবাদত মানুষ তখনই করবে, যখন তাঁর অদৃশ্য সত্তা ও অসীম ক্ষমতার ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করবে। মূসা (আঃ)-এর কওম এজন্যই দাবী করেছিল যে, لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً 'আমরা কখনোই তোমার কথা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাব' *(বাক্বারাহ ২/৫৫)*।

স্বেচ্ছাচারী ও আত্মপূজারী মানুষ চিরকাল এভাবেই কপট দাবী ও অন্যায় যুক্তির মাধ্যমে নিজেদের হঠকারিতাকে আড়াল করতে চেয়েছে। অথচ সে কখনো নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা করেনি। সে কিভাবে জন্ম নিল, কিভাবে বড় ও শক্ত-সমর্থ হ'ল, অতঃপর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হ'ল- কিছুই সে ভাববার অবকাশ পায়নি। কিভাবে তার খাদ্য যোগানো হচ্ছে, তাকে আলো-বাতাস সরবরাহ করা হচ্ছে, বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে সে কাজ করছে, অথচ তারই একজন পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী ভাই বা বোন বুদ্ধিহীন অপগণ্ড হয়ে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে- এসব চিন্তা তার মাথায় আসেনি। শয়তানী ধোঁকায় পড়ে সে আত্ম অহংকারে মত্ত হয়ে পড়েছে এবং অবশেষে নিজের সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করছে।

কারাগারের ঐ উঁচু দেওয়ালের ভিতরের খবর বাইরের লোকেরা কিছুই জানে না। তাই বলে কি তারা কয়েদখানায় বিশ্বাস করে না? অনুরূপভাবে পরকালের অদৃশ্য পর্দা উন্মোচিত হওয়ার পূর্বে কি সেখানকার খবরাখবরে বিশ্বাস করা যাবে না? সেই খবরদাতা যদি কোন নবী-রাসূল হন, তাহ'লেও কি নয়? তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা হাছিলের জন্য শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মি'রাজে নিয়ে জান্নাত-জাহান্নাম ও অন্যান্য সবকিছু দেখানো হ'ল। তিনি সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসে জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিলেন। এরপরেও

কি অবিশ্বাস? আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 'ইতিপূর্বে তুমি এ দিনটি সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। আজ তোমার চোখ থেকে সেই পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' *(ক্বাফ ৫০/২২)*। দুনিয়া স্বপ্নজগৎ সদৃশ। মৃত্যুর পর চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে মানুষের এ স্বপ্নজগৎ শেষ হয়ে যাবে ও জাগরণের জগৎ শুরু হবে। অতঃপর পরকাল সম্পর্কিত সকল বিষয় তার সামনে এসে যাবে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذاَ مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا 'পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে'। অতএব পরজগতে প্রবেশ না করেও কি সেখানকার গায়েবী খবরে বিশ্বাস করা যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। কেবল প্রয়োজন আত্মঅহমিকা ও হঠকারিতাকে দমন করা।

'হাক্কুল্লাহ' তথা আল্লাহ্র নিয়মিত ইবাদত মানুষকে নিরহংকার বানায়। সে ক্রমে বিনয়ী হয়ে ওঠে। তার হৃদয় জগৎ আলোকিত হয়। বাকী দু'টি হক তথা হাক্কুন নাফ্স ও হাক্কুল ইবাদ আদায়ে সে তৎপর হয়ে ওঠে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব যত বেশী সে অনুভব করে, আল্লাহভীতি তার মধ্যে তত বেশী প্রগাঢ় হয়। একারণেই হাদীছে জিব্রীলে 'ইহসান'-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ- 'তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহ'লে এতটুকু বিশ্বাস রাখ যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৩] মানুষ সর্বদা আল্লাহ্র চোখের সম্মুখে রয়েছে। দিনে হৌক, রাতে হৌক, ভূগর্ভে হৌক, ভূপৃষ্ঠে হৌক বা অন্তরীক্ষে হৌক, আল্লাহ্কে লুকিয়ে কোন কিছুই করার ক্ষমতা কারু নেই। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের হাত-পা-দেহচর্ম সবই তার সারা জীবনের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। এসব অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীদের এড়িয়ে মানুষের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। এরপরেও তার সাথে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা। যারা সর্বদা তার দৈনন্দিন আমলনামা লিখছে। ক্বিয়ামতের দিন চূড়ান্ত হিসাবের সময় জীবন সাথী ঐ ফেরেশতা দু'জন তাদের প্রস্তুতকৃত

১৩. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮ (১); মিশকাত হা/২।

আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করবে। অবশ্য তওবাকৃত পাপগুলো হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে তারা তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে তার যথাযোগ্য স্থানে *(ক্বাফ ৫০/২১, ২৩-২৪)*।

অতএব আল্লাহ্র ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক যথাযথভাবে আদায় করে যেতে হবে। উক্ত ইবাদত দৈহিক হৌক যেমন ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি, কিংবা আর্থিক হৌক যেমন যাকাত-ওশর-ফিৎরা-ছাদাক্বাহ ইত্যাদি, কিংবা দৈহিক ও আর্থিক সমন্বিত হৌক যেমন হজ্জ-ওমরাহ ইত্যাদি। সকল ইবাদতেরই লক্ষ্য হ'তে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। যেখানে কোন রিয়া বা শ্রুতি থাকবে না। ছালাত হ'ল আল্লাহ্র যিকরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত সুন্দরভাবে আদায় করতে পারলেই বাকী সব ইবাদত সহজ হয়ে যায়। শরী'আত নির্ধারিত এইসব ইবাদতের বাইরে বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তরীকার যিকরের অনুসরণ করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। এমন কিছু কিছু যিক্র রয়েছে, যা মুখে উচ্চারণ করাও শিরক। যেমন 'যত কল্লা তত আল্লাহ', নূর নবী, নূরে মুজাস্সাম, আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, মুহাম্মাদ নূরের তৈরী, তিনি ধ্যানের ছবি, যিনি মুরশিদ তিনিই খোদা, ফানা ফিল্লাহ, বাক্বা বিল্লাহ ইত্যাদি। আরবী-ফার্সী-উর্দূ ভাষায় অজ্ঞ বাংলাভাষী ভক্তদের মুখ দিয়ে প্রতিনিয়ত এসব যিক্র বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর অন্যদিকে নযর-নেয়াযের নামে ভক্তির চোরাগলি দিয়ে তাদের পকেট ছাফ করে যাচ্ছে একদল ধর্ম ব্যবসায়ী চতুর লোক। সবচাইতে ভয়াবহ যে বিষয়টি এরা তাদের অনুসারীদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করে দিয়েছে, সেটা হ'ল- 'পীর-আউলিয়ারা মরেন না। তারা কবরে গেলেও যেন্দা থাকেন এবং তাঁদের অসীলায় মুক্তি পাওয়া যায়'। তাই ভক্তরা খুশী ও নাখুশী সর্বাবস্থায় পীরবাবার কবরে টাকা ফেলেন, তাঁকে খুশী রাখার জন্য। দুর্ভাগ্য, এগুলোই এদেশে ধর্ম নামে পরিচিত। অথচ এগুলো ধর্ম নয়, বরং ধর্মচ্যুতি। অতএব এদের কপোলকল্পিত বানোয়াট যিকর ও যিকরের অনুষ্ঠান হ'তে দূরে থেকেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে।

অনেকে ইবাদত পালন করাকে বাহুল্য মনে করেন এবং 'নিজে ভাল আছি' বলে আত্মতুষ্টি লাভ করেন। অথচ কোন যুবক যদি নিজেকে শক্তিমান ভেবে খানাপিনা ত্যাগ করে, তাহ'লে সে যেমন দুর্বল হয়ে যাবে। কোন

সৈনিক নিজেকে যোগ্য ভেবে তার দৈনিক নির্ধারিত অনুশীলন বাদ দিলে সে যেমন বাতিলযোগ্য হয়ে যাবে। কোন ছাত্র তার সিলেবাস অনুসরণে নিয়মিত পড়াশুনা না করলে যেমন সে ব্যর্থকাম হবে। অনুরূপভাবে নিয়মিত ইবাদতের মাধ্যমে রূহের খোরাক না যোগালে মানুষের রূহ মরে যাবে ও সেখানে পশু প্রবৃত্তি জয়লাভ করবে। মনোযোগ আসুক বা না আসুক ইবাদত করাটাই যরূরী। যদি কেউ সরকারের হুকুম মোতাবেক খাজনা-ট্যাক্স পরিশোধ না করে এই অজুহাতে যে মনে ভাল লাগে না। তাহ'লে সরকার যেমন তাকে মাফ করবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ নির্ধারিত ফরয ইবাদত আদায় না করলে তাকে মাফ করা হবে না, বরং জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে।

নিয়মিত খুশূ-খুযূর সাথে ইবাদত করলে নফস অনুগত হবে, রূহ তাযা থাকবে। কর্মজগৎ সুন্দর হবে। যদি কেউ ইবাদতে গাফলতি করে বা মন বসাতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে সে তার অজান্তেই শয়তানের শৃংখলে আবদ্ধ হবে। যে শৃংখল থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানুষ কোন অবস্থাতেই শৃংখলের বাইরে নয়। হয় তাকে আল্লাহ্র শৃংখলে থাকতে হবে, নয় তাকে শয়তানের শৃংখলে থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে হবে সে কোন্ শৃংখলে থাকতে চায়। আমাদেরকে অবশ্যই শয়তানের শৃংখল ছিন্ন করে আল্লাহ্র শৃংখলে আবদ্ধ থাকতে হবে। তাতেই মুক্তি, তাতেই শক্তি, তাতেই জান্নাত।

তিনটি হক আদায়ে তারতম্য :

স্বাভাবিক অবস্থায় তিনটি হক সর্বদা সমভাবে আদায় করে যেতে হবে। নইলে 'ইনসানে কামেল' থাকা যাবে না। তবে সময় বিশেষে একেকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন প্রচণ্ড দাবদাহে আপনার জীবন ওষ্ঠাগত। কোনমতেই সহ্য করতে পারছেন না। এ অবস্থায় আপনি ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলে ক্বাযা করতে পারেন। এখানে হাক্কুল্লাহ্র উপরে হাক্কুন নাফ্স প্রাধান্য পেল। পাশেই মসজিদ। অলসতায় ঘরে ফরয ছালাত আদায় করতে মন চাচ্ছে। তা হবে না, আপনাকে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে মন চাচ্ছে না, তাই আজকে আর ছালাত আদায় করব না বা ছিয়াম পালন করব না। তা হবে না। আপনাকে অবশ্যই ফরয

ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে। কেননা এটি শয়তানী ধোঁকা। এখানে অবশ্যই হাক্কুল্লাহ অগ্রাধিকার পাবে। আপনি যাকাত বা ওশরের যোগ্য হয়েছেন। কিন্তু মন চাচ্ছে না দিতে। কিন্তু না, আপনাকে দিতেই হবে যথাযথভাবে ও যথাসময়ে হিসাব করে। এখানে হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ অগ্রাধিকার পাবে। বান্দার আমানত আপনার কাছে রয়েছে, সেটা আদায় করেননি। কাউকে তোহমত দিয়েছেন, গীবত করেছেন, কারু সম্মান নষ্ট করেছেন অথবা আপনার সামনে কেউ বান্দার হক নষ্ট করছে। এমতাবস্থায় হাক্কুল্লাহ্র চাইতে হাক্কুল ইবাদ প্রাধান্য পাবে। মনে রাখতে হবে যে, হাক্কুল ইবাদ নষ্ট করলে বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করবেন না। তাই নফল ছালাত-ছিয়াম ও হজ্জ-ওমরাহ পালনের চাইতে হাক্কুল ইবাদ আদায় করা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এইভাবে মানুষ যখন তিনটি হক-এর তারতম্য বুঝে তা সঠিকভাবে আদায় করবে, তখনই সে 'ইনসানে কামেল' বা পূর্ণ মানুষ হিসাবে গণ্য হবে।

ইনসানে কামেল-এর ১৮টি গুণ :

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ফুরক্বানের ৬৩ থেকে ৭৪ পর্যন্ত ১২টি আয়াতে ১৩টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হ'ল। যার প্রথম ৬টি হ'ল আনুগত্য বিষয়ক ও শেষের ৭টি হ'ল আল্লাহ্র অবাধ্যতা না করা বিষয়ক। এতদ্ব্যতীত হাদীছে আরও ৫টি গুণের কথা এসেছে।

(১) যে ব্যক্তি সর্বদা নিজেকে আল্লাহ্র দাস মনে করে সেমতে তার আচরণকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী রাখে। (২) যে ব্যক্তি সর্বদা নিরহংকারভাবে চলাফেরা করে। (৩) মূর্খদের তাচ্ছিল্যকর আচরণে যারা সর্বদা শান্তভাব অবলম্বন করে। (৪) যারা আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করে। (৫) জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যারা সর্বদা প্রার্থনা করে। (৬) যারা অপচয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে *(ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৭)*।

অতঃপর (৭) যারা আল্লাহ্র সাথে অন্যকে আহ্বান করে না (৮) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে না। (৯) ব্যভিচার করে না (১০) শিরক-বিদ'আত ও মন্দ মেলা ও মজলিসে যোগদান করে না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। (১১) যারা বাজে মজলিসের নিকট দিয়ে গমন করলেও ভদ্রতা সহকারে অতিক্রম করে। (১২) যখন তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ স্মরণ

করানো হয়ে, তখন তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শোনে ও তদনুযায়ী শ্রদ্ধাভরে আমল করে (১৩) যারা সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকটে এই মর্মে প্রার্থনা করে যে, ‘প্রভু হে! তুমি আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের নেতা কর’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৭৪)*।

এতদ্ব্যতীত হাদীছে বর্ণিত ৫টি মৌলিক গুণ হ’ল,

(১৪) যে ব্যক্তি অন্যের জন্য সেই বস্তু ভালবাসে, যা নিজের জন্য ভালবাসে।[১৪] (১৫) যে ব্যক্তি অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করে চলে।[১৫] (১৬) যে ব্যক্তি বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করে।[১৬] (১৭) যে ব্যক্তি মানুষ ও পশু-পক্ষী সকল প্রাণীর প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করে।[১৭] (১৮) অন্যের প্রতি যার ভালবাসা ও বিদ্বেষ স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে হয়ে থাকে।[১৮]

‘ইনসানিয়াত’ হাছিলের মানদণ্ড

হাক্কুল ইবাদ যথাযথভাবে হাছিল করাই হ’ল ইনসানিয়াত হাছিলের মৌলিক মানদণ্ড। হাক্কুল ইবাদ আদায়ে যিনি যত বেশী তৎপর, তার ইনসানিয়াত তত বেশী পূর্ণাঙ্গ। সর্বোত্তম ব্যবহার ও সামাজিক আচার-আচরণের মাধ্যমে পরস্পরের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভূত হয়। মানবতা উচ্চকিত হয়। মানুষ্যত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সেকারণ হাক্কুল ইবাদ আদায় করা দৈনন্দিন অযীফার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি ফরয ছালাত ছেড়ে দিয়ে সওয়ারী বা চোর ধরার নির্দেশও এসেছে হাদীছে।[১৯] মা আয়েশা (রাঃ) ছালাতরত অবস্থায় এগিয়ে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ঘরের দরজা খুলে দিয়েছেন।[২০]

---

১৪. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।

১৫. মুসলিম হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/৫০৭৩।

১৬. তিরমিযী হা/১৯২০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩।

১৭. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯।

১৮. আহমাদ হা/২১৩৪১; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৯; মিশকাত হা/৫০২১।

১৯. বুখারী হা/১২১১ ‘ছালাত অবস্থায় কর্ম’ অধ্যায়-২১, ‘ছালাত অবস্থায় সওয়ারী ধরা’ অনুচ্ছেদ-১১।

২০. আহমাদ হা/২৪০৭৩; আবুদাঊদ হা/৯২২; নাসাঈ, তিরমিযী হা/৬০১; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০০৫ ‘ছালাত’ অধ্যায়।

প্রত্যেকটি হক-এর যাহেরী ও বাতেনী দিক :

প্রতিটি হক-এর জন্য যাহেরী ও বাতেনী দু'টি দিক রয়েছে। যেমন হাক্কুন নাফস আদায় করতে গিয়ে দেহের যাহেরী দিক ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন করা, নিয়মিত নিদ্রা যাওয়া, ব্যায়াম করা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। কেননা দৈহিক সুস্থতার উপরেই বাকী দু'টি হক আদায় নির্ভর করে। সেজন্য ঘুমের কারণে হাক্কুল্লাহ ফরয ছালাত ছুটে গেলেও আল্লাহ নারায হন না। বরং যখনই ঘুম ভাঙবে, তখনই তার ক্বাযা আদায় করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত রোগী ও মুসাফিরের জন্য ফরয ছালাত ও ছিয়ামে রয়েছে ব্যাপক রেয়াত। সেকারণ দৈহিক স্বাস্থ্যের হেফাযত ও পরিচর্যা করা অতীব যরূরী বিষয়।

এর সাথে রয়েছে একটি বাতেনী বিষয়, যা ততোধিক যরূরী। সেটি হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যের হেফাযত। সদা মনমরা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি কখনো প্রকৃত অর্থে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হ'তে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানবদেহের ৮০% রোগের নিরাময় নির্ভর করে তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। যার রূহানী শক্তি যত বেশী সবল, তার দৈহিক স্বাস্থ্য ততবেশী ভাল। আর রূহানী শক্তির চাবিকাঠি হ'ল সর্বদা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা, তাঁর ইচ্ছাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া, নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা ও সর্বদা হাসিমুখে থাকা। আর সৎ ও উন্নত চিন্তা নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবার দৃঢ় মানসিকতা পোষণ করা।

অনুরূপভাবে হাক্কুল ইবাদ-এর রয়েছে ভিতর ও বাহির দু'টি দিক। মানুষ নিজ পরিবার, সমাজ ও সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে চরম তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু যদি এর বিনিময়ে দুনিয়াতে কোন পারিতোষিক কামনা করে, তাহ'লে সেটা হয় স্রেফ যাহেরী সেবা। মানুষের হৃদয়ের গভীরে তা শিকড় গাড়তে পারে না। কিন্তু যদি সেখানে কোন কিছু দুনিয়া লাভের আকুতি না থাকে, এমনকি কৃতজ্ঞতা লাভেরও আকাংখা না থাকে, তাহ'লে সেটা হয় সত্যিকারের নিষ্কাম সেবা। যেটা হ'ল হাক্কুল ইবাদ আদায়ের বাতেনী দিক। এর গভীরতা ও নিষ্কুলষতার পরিমাপ কেবল আল্লাহ করতে পারেন এবং কেবলমাত্র তিনিই এর যথার্থ পুরস্কার দিতে পারেন ইহকালে ও পরকালে।

সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশী সেবার প্রেরণা রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির সেবার এই প্রেরণা শুধুমাত্র স্বভাবজাত কারণেই টিকে থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার লাভের প্রেরণা যুক্ত হয়। তাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের তীব্র আকাংখা থেকেই কেবল সুন্দরতমভাবে হাক্কুল ইবাদ আদায়ের সর্বোত্তম প্রেরণা লাভ সম্ভব হ'তে পারে। আর এই আধ্যাত্মিক প্রেরণাই হ'ল পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। এটাই হ'ল তাক্বওয়া। যা দেখা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায় তার কর্মে। যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায় তার গতি ও ক্রিয়ায়।

হাক্কুল্লাহ্রও রয়েছে যাহেরী ও বাতেনী দু'টি দিক। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত সমূহের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাগুলো যেমন ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হ'তে হবে, তার বাতেনী দিকটাও তেমনি ছহীহ আক্বীদাপূর্ণ হ'তে হবে। যদি খালেছ আল্লাহ্র জন্য না হয়ে তা অন্যের জন্য হয় অথবা সেখানে 'রিয়া' বা শ্রুতি স্থান পায়, তাহ'লে পুরা ইবাদতটাই বরবাদ হয়ে যাবে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত ও অন্যান্য নফল ছালাত আদায় করার মাধ্যমে মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের কথা এবং স্রেফ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি শুভকাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তাঁর প্রশংসা করা এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ দো'আ সমূহ পাঠের মাধ্যমে সর্বদা নিজেকে শয়তানের শৃংখল থেকে মুক্ত করে আল্লাহমুখী করার মাধ্যমে মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহভীরু হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে পশুত্ব পরাজিত হয় এবং মনুষ্যত্ব বিজয়ী হয়। অতঃপর এভাবে অধিকাংশ 'ইনসানে কামেল' সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্যিকারের মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অমানুষেরা পিছুটান দেয়।

'কামালিয়াত' রক্ষার উপায়

'ইনসানে কামেল' তার 'কামালিয়াত' বা পূর্ণতা রক্ষার জন্য সর্বদা দু'টি বিষয়কে অপরিহার্য গণ্য করবেন। (১) নিজের চিন্তা জগতকে সর্বদা আখেরাতমুখী রাখবেন এবং দুনিয়াবী সকল কাজকর্মকে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত করবেন। (২) সর্বদা সমমনা সত্যবাদী লোকদের সাথে

সংঘবদ্ধ থাকবেন। কারণ উত্তম পরিবেশ ব্যতীত উত্তম কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তাদের সাথেই থাকবে, যাদেরকে সে দুনিয়াতে ভালবাসতো’।[২১]

হুঁশিয়ারী :

আজকাল প্রায় সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য হ’ল ‘দুনিয়া’। অপরদিকে ধর্মীয় সংগঠন বলে যেগুলো রয়েছে, তার অধিকাংশের আক্বীদা ও আমলে রয়েছে শিরক ও বিদ‘আতের জঞ্জাল। এতদ্ব্যতীত সেখানে অধিকাংশের মধ্যে নেই কোন হাক্কুল ইবাদ রক্ষা বা সমাজসেবার পরিকল্পনা বা কর্মসূচী। এসব কারণে যাচাই-বাছাই না করে কোন সংগঠনে প্রবেশ করা ঠিক নয়। একজন ইনসানে কামেল-এর জন্য প্রকৃত সংগঠন সেটাই হ’তে পারে, যেখানে গেলে তাদের সংস্পর্শে তার ‘কামালিয়াত’ কেবল অক্ষুণ্ণই থাকবে না, বরং ক্রমেই সমুন্নত হবে। এ বিষয়ে উত্থাপিত কতগুলো প্রশ্ন ও তার জবাব নিম্নে প্রদত্ত হ’ল।-

প্রশ্ন-১ : বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য এবং বন্ধুত্বের সীমারেখা কি?

উত্তর : বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ’ল দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি লাভ। সেকারণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভই হবে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার প্রকৃত মানদণ্ড। এতে দুনিয়াবী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হ’লেও তা বরদাশত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ ‘...বন্ধুত্ব হবে আল্লাহ্র জন্য, বিদ্বেষও হবে আল্লাহ্র জন্য’।[২২] বন্ধুত্ব ও শত্রুতার একটা সীমারেখা থাকবে, যেখানে কোনরূপ অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি থাকবে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْناً مَّا عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْماً مَّا وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا- ‘বন্ধুর সাথে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব রাখ (আধিক্য করো না)। হ’তে পারে সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শত্রুর সঙ্গে স্বাভাবিক শত্রুতা রাখ (বাড়াবাড়ি দেখিয়ো না)। হ’তে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।[২৩]

---

২১. বুখারী হা/৬১৬৭; মুসলিম হা/২৬৩৯; মিশকাত হা/৫০০৯।

২২. ত্বাবারাণী, বাগাভী, মুছান্নাফ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫০১৪; ছহীহাহ হা/৯৯৮।

২৩. তিরমিযী হা/১৯৯৭; আলবানী, ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩২১।

প্রশ্ন-২ : ঐক্য সৃষ্টি ও ঐক্যজোট রক্ষার মূলনীতি ও সীমারেখা কি?

উত্তর : দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভই হবে এর মূলনীতি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকামী ও আখেরাতে মুক্তিকামী লোকদের সাথেই কেবল ঐক্য সৃষ্টি বা ঐক্যজোট গঠন ও তা রক্ষা করতে হবে। যখনই যেখানে দুনিয়াবী স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে ও সংশোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবে, তখনই সেখান থেকে বিদায় নিতে হবে। এমতাবস্থায় 'একলা চলো নীতি' গ্রহণের চাইতে অন্য বন্ধু তালাশ করার মধ্যেই কল্যাণ বেশী থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কারণেই মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন ৭৫ জন বায়'আতকারী সাথীর আমন্ত্রণে। এখানেও সীমারেখা পূর্বের মত থাকবে। কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কেননা শয়তান অধিকাংশ সময় বন্ধুর মুখোশ ধরেই এসে থাকে। কোন নবীই এদের হামলা থেকে মুক্ত ছিলেন না *(আন'আম ৬/১১২)*। আজকাল ঐক্যের জোয়ারে দুনিয়া ভাসছে। অধিকাংশের উদ্দেশ্য স্রেফ 'দুনিয়া'। অথচ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ঐক্য আল্লাহ্‌র মনঃপুত নয়। তা কখনোই টেকসই নয় এবং আন্তরিকও নয়, বরং প্রতারণাপূর্ণ। এতে কোন নেকীও নেই, আখেরাতও নেই। এই সব জগাখিচুড়ী ঐক্য নোংরা ড্রেনের মত। যেখানে পাকা কলার খোসাও থাকে, পচা বিড়ালের লাশও থাকে। অতএব ঐক্য সর্বদা প্রশংসিত নয়।

প্রশ্ন-৩ : সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর : দু'টি বৈধ বিষয়ের মধ্যে কোনটা অগ্রাধিকার পাবে, সেটা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অগ্রগণ্য। যদিও তা অনেক সময় ভুলও হ'তে পারে। কিন্তু অবৈধ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ কৃত হালাল ও হারামের ব্যাপারে কারু মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই কেবল সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মূলতঃ নামসর্বস্ব হয়ে গেছে। এমনকি জাতিসংঘের মত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঐক্যপ্রতিষ্ঠানেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে পদদলিত করে 'ভেটো' ক্ষমতার অধিকারী ৫টি রাষ্ট্র বিশ্বের প্রায় দু'শোটি সদস্য রাষ্ট্রের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। বরং বলা চলে যে, এক আমেরিকাই সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে ছলে-বলে-কৌশলে ও তার পাশব শক্তির জোরে। গণতন্ত্রের নামে গঠিত জাতীয় সংসদে দলনেতার ইচ্ছা-

অনিচ্ছার বাইরে উক্ত দলের কোন সদস্যের নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কেননা তাতে ফ্লোর ক্রসিং আইনে তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। ফলে সেখানে গিয়ে নেতা বা নেত্রীর সমর্থনে টেবিলে চাপড়ানোই তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত কোন আবশ্যিক বিষয় নয়, যদি না তা ইসলামী বিধানের অনুকূলে হয়। যখন কোন সংগঠনে দুনিয়াদারদের সংখ্যাধিক্য হবে কিংবা নেতৃত্ব দুনিয়া পূজারী হবে, তখন সেই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। হকপন্থী বাতিলপন্থী জগাখিচুড়ী সংগঠনের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) তুমি ওদেরকে সংঘবদ্ধ ভেবেছ? অথচ ওদের অন্তরগুলো বিভক্ত' *(হাশর ৫৯/১৪)*। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর উপরে ভরসা করে একাই কাজ করে যেতে হবে এবং এতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আল্লাহভীরুদের অন্তর নিশ্চয়ই সেদিকে ধাবিত হবে। ফলে দ্বীনদারগণের জামা'আত বড় ও শক্তিশালী হবে। দুনিয়াদারদের কেবল জৌলুস থাকবে ও নাম থাকবে। কিন্তু সেখান থেকে বরকত উঠে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার 'হানীফ' ও মদীনার ইহূদী-নাছারাদের দল বড় ও শক্তিশালী ছিল। তাদের মধ্যে দ্বীনের বড়াই ছিল, কিন্তু দ্বীন ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রকৃত দ্বীনের দিকে একাই মানুষকে আহ্বান জানালেন। ফলে দ্বীনদারগণের অন্তর তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। বড় দলের নেতারা গোত্রনেতা আবু তালেব-এর নিকট এসে তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদ সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেন, الَّذِي قَدْ خَالَفَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، وَفَرَّقَ جَمَاعَةَ قَوْمِكَ، وَسَفَّهُ أَحْلاَمَهُمْ، فَنَقْتُلَهُ– 'সে আপনার ও আপনার বাপ-দাদাদের দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, আপনার সম্প্রদায়ের ঐক্যকে বিভক্ত করেছে এবং তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলেছে। অতএব আমরা তাকে হত্যা করব'।[২৪] আবু তালেব তাদের কথা মানলেন না। ফলে শুরু হ'ল অত্যাচার-নির্যাতন ও বিতাড়নের পালা। কিন্তু এতে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের গতি আরো বাড়লো। অবশেষে দুর্বল দ্বীনদারগণের সংগঠনই বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত হ'ল।

ঐক্যের ভিত্তি ও সত্য-মিথ্যা ঐক্যের ফলাফল

ঐক্যের ভিত্তি হ'ল মহৎ উদ্দেশ্য, বিনয় ও সহনশীলতা। যেটা সাধারণতঃ হকপন্থী সমমনাদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যার দ্বারা 'হক' শক্তিশালী হয়। কিন্তু আজকাল সে স্থান দখল করেছে কূটনীতি ও চাটুকারিতা। ফলে ঐক্য কেবল শ্রুতিমধুর একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। যার সত্যিকারের কোন বাস্তবতা নেই। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা ঐক্যের ফলাফল এটাই হয়ে থাকে যে, হকপন্থী ব্যক্তি বা দল বাতিলপন্থী ব্যক্তি বা দলের নিকটে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। এমনকি তারা তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদের মাঝে বিলীন হয় না। এর কারণ হ'ল এই যে, হক সর্বদা প্রবৃত্তির পরিপন্থী, আর বাতিল সর্বদা প্রবৃত্তির অনুগামী। ফলে 'কিছু ছাড় ও কিছু গ্রহণ কর' এই নীতির ভিত্তিতে যখন উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হকপন্থী তার হক থেকে কিছু ছাড় দিয়ে হক-এর ক্ষতি করে। কিন্তু বাতিলপন্থী তার বাতিল থেকে কিছু ছাড় দিলেও তার কোন ক্ষতি হয় না। বরং বাস্তবে এটাই দেখা যায় যে, হকপন্থীকেই কেবল ছাড় দিতে হয়, বাতিলপন্থীকে নয়। কারণ নফসের পূজারীদের সংখ্যাধিক্য থাকার কারণে তারাই সর্বদা বিজয়ী হয়।

অতএব 'হক'-কে অক্ষুণ্ন রেখে এবং হক-এর বিজয়ের স্বার্থেই কেবল সাময়িক ঐক্যজোট হ'তে পারে। যদিও তা টেকসই হয় না। যেমন 'মদীনার সনদ' রচনা সত্ত্বেও ইহূদীদের সাথে গঠিত ঐক্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ) সাময়িকভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। অতএব বাতিলপন্থীদের সাথে কেবল বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে, আন্তরিক সম্পর্ক কখনোই নয়।

একজন 'ইনসানে কামেল' দল-মত নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবেন এবং সর্বদা সবাইকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিবেন। তিনি সবার সাথে থাকবেন। কিন্তু চলবেন নিজস্ব পথে। পৃথিবী ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। বিশ্বমানবতার মধ্যে ক্রমেই শুরুর ন্যায় এক জাতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। তাই আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। পোষা পাখি মনিবের ডাক পেলে যেমন দৌড়ে আসে, জান্নাত

---

২৪. সীরাতে ইবনে হিশাম (মিসরী ছাপা ২য় সংস্করণ ১৩৭৫ হি./১৯৫৫ খৃ.) ১/২৬৭ পৃঃ।

হারা বনু আদম তেমনি জান্নাতের সন্ধান পেলে আবারও ছুটে আসবে ইসলামের দিকে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে, আল্লাহ্র প্রেরিত অহি-র বিধানের দিকে। 'ইনসানে কামেল'-কে সর্বদা সে পথেরই একজন 'দাঈ' বা আহ্বানকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সত্যের পথের পথিককে সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, হাক্কুন নাফ্স, হাক্কুল ইবাদ বা হাক্কুল্লাহ যেটাই আদায় করি না কেন, সর্বদা লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। উদ্দেশ্য থাকবে দ্বীন। পদ্ধতি হবে সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন। এই মূল সত্য থেকে বিচ্যুত হ'লেই শয়তান আমাকে ধরে ফেলবে এবং জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে। অতএব যেকোন কষ্ট ও নির্যাতন এমনকি মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায় দ্বীনকে হাতছাড়া করা যাবে না। নিজের চিন্তাজগতকে সর্বদা আখেরাতমুখী করে রাখতে হবে। দুষ্টু ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে রাখার ন্যায় শয়তানের দিকে ধাবিত মনকে জোর করে ধরে আখেরাতমুখী করতে হবে। সর্বদা সমমনা তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিদের সাথে থাকতে হবে ও দুনিয়াদারদের সঙ্গ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে। যদিও বাহ্যিক সদ্ভাব সবার সাথেই রাখতে হবে।

তাক্বওয়া সবকিছুর মূল :

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, তিনটি হক-এর পূর্ণাঙ্গতার চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতার মধ্যে। যার মধ্যে তাক্বওয়ার পরিমাণ যত বেশী, তিনি তত বেশী পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা 'ইনসানে কামেল'। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

ইনসানে কামেল-এর কতগুলি দৃষ্টান্ত

১. (ক) আবুবকর (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা : আবুবকর (রাঃ) খেলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বশেষ প্রেরিত সেনাবাহিনী তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে মদীনায় ফিরে এসেছে। মদীনার চারিদিকে মুনাফিকদের ও ইহূদী-নাছারাদের ষড়যন্ত্র এবং দলে দলে

ইসলাম পরিত্যাগের হিড়িক। আরেক দলের যাকাত অস্বীকারের ঘোষণা। অন্যদিকে ভণ্ডনবীদের উত্থান। এরূপ বৈরী পরিস্থিতিতে সেনাদের রাজধানী রক্ষার জন্য মদীনায় রাখা হবে, না বাইরে প্রেরণ করা হবে, এ নিয়ে শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণের মধ্যে আলোচনা হ'ল। ওমর (রাঃ) সহ অধিকাংশের পরামর্শ হ'ল, এ মুহূর্তে রাজধানী মদীনার নিরাপত্তা রক্ষাই হবে বড় কর্তব্য। তাছাড়া সেনাপতি পরিবর্তন করাও আবশ্যক। কারণ সেনাপতি ওসামা বয়সে তরুণ (মাত্র ১৮ বছরের)। জবাবে খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন, وَاللهِ لاَ أَحُلُّ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَلَأُجَهِّزَنَّ جَيْشَ أُسَامَةَ 'আল্লাহ্‌র কসম! যে পাগড়ী রাসূল (ছাঃ) বেঁধেছেন, তা আমি খুলবোনা।... এবং আমি অবশ্যই ওসামার সেনাদল প্রেরণ করব'। এসময় আনছারদের কেউ কেউ ওমরকে বলেন, উসামা ব্যতীত অন্য কাউকে আমাদের উপর সেনাপতি করা হৌক। একথা জানানো হ'লে আবুবকর (রাঃ) বলেন, ওমর তোমার ধ্বংস হৌক! আমি কি রাসূল (ছাঃ)-এর নিযুক্ত সেনাপতি ব্যতীত অন্যকে সেনাপতি করব? অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র নামে ওসামার সেনাদলকে রওয়ানা করে দিলেন এবং মদীনার চারিদিকে দক্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে পাহারা দল নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ৪০ বা ৭০ দিন পর রোমকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী বেশে ওসামার দল মদীনায় ফিরে এল। এতে সবার মধ্যে ঈমান দৃঢ় হ'ল এবং শত্রু-মিত্র সবার মধ্যে নতুন মাদানী রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হ'ল। এভাবে খলীফা হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ কঠোরভাবে রক্ষা করলেন। স্রেফ আল্লাহ্‌র উপরে অটুট ভরসাই ছিল তাঁর শক্তির মূল উৎস।[২৫]

১. (খ) আবুবকর (রাঃ)-এর দৃঢ়তা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর যাকাত জমা নিয়ে তাঁর দো'আ পাবার সুযোগ নেই, সেই খোঁড়া অজুহাতে একদল লোক নতুন খলীফার নিকটে যাকাত জমা করতে অস্বীকার করল। শূরার বৈঠক বসল। খলীফা আবুবকর (রাঃ) ওদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু শূরা দ্বিমত পোষণ করল। এমনকি ওমর (রাঃ) বললেন, হে খলীফা! তারা যে কলেমাগো মুসলমান। আপনি কিভাবে

---

২৫. বুখারী হা/৩৭৩০, ৪৪৬৮-৬৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩০৪-০৫ 'ওসামা বিন যায়েদ-এর সেনাদল প্রেরণ' অনুচ্ছেদ।

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? খলীফা বলে উঠলেন, وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি ছালাত ও যাকাতের দু'টি ফরয (একটি হাক্কুল্লাহ অন্যটি হাক্কুল ইবাদ)-এর মধ্যে পার্থক্য করে। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে যাকাত হিসাবে জমাকৃত একটি বকরীর দড়িও যদি কেউ আজকে দিতে অস্বীকার করে, তাহ'লে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব'। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম, আবুবকরের বক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রসারিত হয়ে গেছে এবং আমি বুঝলাম যে, তিনি হক-এর উপরে আছেন'।[২৬]

এই যুদ্ধের ফলে ভবিষ্যতে আর কেউ কোন ফরয বিধানকে এড়িয়ে যাবার বা হালকা করে দেখার সাহস পায়নি। এভাবে হাক্কুল ইবাদ রক্ষার ফলে ইসলামী খেলাফতের আর্থিক ভিত মযবুত হ'ল। গরীবদের অধিকার রক্ষা পেল।

২. (ক) দানের প্রতিযোগিতায় ওমর (রাঃ) : ৯ম হিজরীতে (তাবূক যুদ্ধের প্রাক্কালে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। ওমর (রাঃ) বলেন, তখন আমার নিকটে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম, দানের প্রতিযোগিতায় আজ আমি আবুবকরের উপরে জিতে যাব। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হ'লাম। তিনি বললেন, পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? আমি বললাম, অনুরূপ পরিমাণ। এ সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে হাযির হ'লেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আবুবকর! তোমার পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? তিনি বললেন, أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ 'তাদের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি'। ওমর বলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আর আমি কখনোই তাঁর উপরে জিততে পারব না'।[২৭]

---

২৬. বুখারী হা/৬৯২৫; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০ 'যাকাত' অধ্যায়।
২৭. তিরমিযী হা/৩৬৭৫; আবুদাঊদ হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/৬০২১ 'আবুবকরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

Contents

২. (খ) ওমর (রাঃ)-এর অন্তরে হক নিক্ষিপ্ত হয় : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিল 'মুহাদ্দাছ' (مُحَدَّثُونَ)। যাদের অন্তরে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে হক নিক্ষিপ্ত হ'ত। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ এমন হয়, তবে সে ওমরই হবে'।[২৮] যেমন (১) বদরের যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে তাঁর মতামতের পক্ষে সূরা আনফাল ৬৭ আয়াত নাযিল হয়। তাছাড়া (২) পর্দা ফরয করা বিষয়ে সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত (৩) রাসূল (ছাঃ)-কে স্বীয় স্ত্রীদের তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণের এখতিয়ার দিয়ে সূরা তাহরীমের ৫ আয়াত নাযিল (৪) মাক্বামে ইবরাহীমকে মুছাল্লা নির্ধারণ করে সূরা বাক্বারাহ ১২৫ আয়াত নাযিল এবং (৫) মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণ না করার স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে সূরা তওবা ৮৪ আয়াত নাযিল ইত্যাদি ঘটনা সমূহ।

২. (গ) ওমর (রাঃ)-এর বিনয় ও দূরদর্শিতা : কনিষ্ঠ ছাহাবী তারেক ইবনু শিহাব (মৃ. ৮৩ হি.) বলেন, খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৩ খৃ.) শাম বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। তখন আমাদের সঙ্গে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) ছিলেন। অতঃপর শামের নেতারা তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য একটি নীচু জলাভূমির দিকে এগিয়ে এল। এমতাবস্থায় ওমর (রাঃ) তাঁর উট থেকে নামলেন, তাঁর মোজা দু'টি খুললেন ও স্বীয় স্কন্ধে রাখলেন। অতঃপর উটের লাগাম ধরে তিনি জলাভূমির দিকে নেমে গেলেন। তখন আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বললেন, يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبَطَارِقَةُ الشَّامِ وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ هَذَا؟ 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছে সেনাবাহিনী ও শামের ধর্মনেতাগণ। অথচ আপনি এ অবস্থায়?

জবাবে তিনি বললেন, إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلاَمِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ– 'আমরা ছিলাম লাঞ্ছিত জাতি। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অতএব যখনই

২৮. বুখারী হা/৩৪৬৯; মুসলিম হা/২৩৯৮; মিশকাত হা/৬০২৬ 'ওমরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

আমরা এই সম্মান ব্যতীত অন্যত্র সম্মান তালাশ করব, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلاَمِ، فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ– 'আমরা এমন একটি জাতি, যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অতএব আমরা এটি ব্যতীত অন্যকিছুর মাধ্যমে সম্মান চাই না'।[২৯]

ঘটনাটি ছিল ১৫ হিজরী সনে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের সাথে জড়িত। তা এই যে, প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) দামেশ্ক বিজয় সম্পন্ন করে ঈলিয়া (যেরুযালেম)-এর খ্রিষ্টান নেতাদের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের অথবা জিযিয়া প্রদানের আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। তখন তিনি তাদের উপর অবরোধ আরোপ করেন। ফলে তারা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। কিন্তু শর্ত দেয় যে, আমীরুল মুমিনীনকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে আসতে হবে। আবু ওবায়দাহ কথাগুলি লিখে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট পত্র পাঠান। তখন তিনি ওছমান (রাঃ)-এর নিকট পরামর্শ নেন। তিনি শর্তটি হীনকর ভেবে যেতে নিষেধ করেন। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-এর নিকট পরামর্শ নেন। তিনি তাঁকে যেতে বলেন। কারণ এটি হবে অবরোধ স্থায়ী করার চাইতে হালকা বিষয়। তখন ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী সহ বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর তারা দামেশক পৌঁছলে সেখানে প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দাহ এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্য সেনাপতিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তাঁরা বায়তুল মুক্বাদ্দাস পৌঁছে খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধি করেন ও বিজয় সম্পন্ন হয়।[৩০]

২. (ঘ) ওমর (রাঃ)-এর দায়িত্বশীলতা : তাঁর মুক্তদাস আসলাম বলেন, একদিন আমরা খলীফার সাথে বাজারে গেলাম। তখন জনৈকা বিধবা যুবতী তাঁকে বললেন, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এই কন্যাটি রেখে গেছেন। অথচ তিনি কোন সম্পত্তি বা দুগ্ধবতী পশু রেখে যাননি। ক্ষুধায় বাচ্চাটি হয়ত

---

২৯. হাকেম হা/২০৭-০৮; ছহীহাহ হা/৫১।

৩০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ 'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়' অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড ৫৫ পৃ.।

মারা যাবে। আমি খুফাফ বিন ঈমা আল-গিফারী-এর কন্যা। যিনি হোদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন। একথা শুনে ওমর (রাঃ) তখনই ফিরে এলেন এবং দুই বস্তা খাদ্যশস্য, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে উট বোঝাই করলেন। অতঃপর উটের লাগাম ধরে তিনি নিজে সেখানে গেলেন ও তাকে বললেন, এগুলি শেষ করতে থাক। যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি উত্তম পথ বের করে দেন' *(বুখারী হা/৪১৬১)*।

শাসক ও শাসিতের এই স্বাধীনতার তুলনা কোথাও আছে কি? উভয়ের স্বাধীনতা অহি-র বিধান দ্বারা সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত। যা নিশ্চিত হ'তে পারে কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির মাধ্যমে এবং তার প্রেরিত অহি-র বিধানের অনুসরণে হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ যথার্থভাবে রক্ষা করার মাধ্যমে। যেমন মা'ক্বিল বিন ইয়াসার বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 'আল্লাহ যদি কাউকে প্রজাদের উপরে দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে তাদের বিষয়ে খেয়ানতকারী হিসাবে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মুসলিম হা/১৪২)*।

খেলাফতের দায়িত্বে (১৩-২৩হি./৬৩৪-৬৪৩ খৃ.) থাকা অবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, لَوْ مَاتَتْ سَخْلَةٌ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ضَيْعَةً لَخِفْتُ أَنْ أُسْأَلَ عَنْهَا 'যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি বকরীর বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি ভীত হই যে, সেজন্য আমাকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'।[৩১]

৩. ওছমান (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা : তাঁর মুক্তদাস আবু সাহলাহ (রাঃ) বলেন, বিদ্রোহী দল কর্তৃক অবরোধ কালে আমরা বললাম, হে খলীফা!

৩১. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪১৫। একই মর্মে আবু নু'আইম-এর হিলইয়াহ (১/৫৩)-তে এসেছে, 'বকরী' (شَاةٌ), মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (হা/৩৫৬২৭)-তে এসেছে, 'ভেড়ার বাচ্চা' (وَلَدُ الضَّأْنِ), তারীখুত ত্বাবারী (৪/২০২)-তে এসেছে, 'উট' (جَمَلٌ)। কোনটির সনদ ছহীহ না হ'লেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় 'হাসান লিগাইরিহী' স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাহকীক : আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আব্দুল মুহসিন, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪১৯ হি.। গৃহীত : ইউসুফ বিন হাসান ইবনুল মুবাররাদ দামেশ্ক্বী (৮৪০-৯০৯ হি.), মাহযুছ ছাওয়াব ফী ফাযায়েলে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, ৬২১ পৃ. অনুচ্ছেদ-৫৭।

আমরা কি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে একটি বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন। অতএব আমি তদনুযায়ী ধৈর্য ধারণ করে অবিচল থাকব' *(হাকেম হা/৪৫৪৩, সনদ ছহীহ)*। আবু হাবীবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, অবরোধকালে আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরত ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে আসেন এবং হাম্দ ও ছানা পাঠের পর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার পরে তোমরা ভীষণ ফিৎনা ও মতানৈক্যে পতিত হবে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে অবস্থায় আমরা কি করব? উত্তরে তিনি ওছমান-এর দিকে ইশারা করে বললেন, তোমরা আমীর ও তার সাথীদের আনুগত্যে দৃঢ় থাকবে' *(হাকেম হা/৮৩৩৫, সনদ ছহীহ)*। মুর্‌রাহ বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে একদিন ফিৎনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি এবং তা যে অতি নিকটবর্তী তিনি সেটাও বর্ণনা করেন। ঐ সময় কাপড়ে মাথা ঢেকে একজন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার দিকে ইশারা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফিৎনার দিন ঐ ব্যক্তি সঠিক পথের উপরে থাকবে। তখন আমি দ্রুত লোকটির নিকটে গেলাম এবং দেখলাম যে, তিনি ওছমান বিন আফ্ফান। তখন আমি তাঁর চেহারা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, ইনিই কি তিনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[৩২]

উপরের হাদীছগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, খলীফা ওছমান (রাঃ) হক-এর উপরে ছিলেন এবং তাঁর বিরোধীরাই ছিল বাতিলের উপর। ওছমান (রাঃ) নিজের জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেননি। কারণ তাতে বহু মুসলমানের রক্তপাত ঘটত। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন 'ইনসানে কামেল'-এর উত্তম দৃষ্টান্ত।

৪. '২য় ওমর' বলে খ্যাত উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রাঃ) আড়াই বছর (৯৯-১০১ হি./৭১৭-৭২০ খৃ.) খেলাফতে থাকার পর মাত্র সাড়ে ৩৯ বছর বয়সে বিষ প্রয়োগে শহীদ হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হ'ল যে, তিনি দু'টি বন্ধ ঘরে সোনা-দানা ভর্তি করে রেখেছেন, যার সবই রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন। পরবর্তী খলীফা

৩২. তিরমিযী হা/৩৭০৪; ইবনু মাজাহ হা/১১১; মিশকাত হা/৬০৬৭ 'ওছমান (রাঃ)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

ইয়াযীদ বিন আব্দুল মালেক অভিযোগকারীকে সাথে নিয়ে ওমরের বাড়ীতে গিয়ে উক্ত কক্ষ দু'টি খুললেন। দেখা গেল সেখানে আছে কেবল একটি চামড়ার চেয়ার, একটি পিতলের বদনা, ৪টি পানির কলসী। অন্য ঘরে আছে একটি খেজুর পাতার চাটাই যা মুছাল্লা হিসাবে রাখা হয়েছে। আর আছে ছাদের সঙ্গে ঝুলানো একটি শিকল। যার নীচে গোলাকার একটি বেড়ী রয়েছে, যার মধ্যে মাথা ঢুকানো যায়। ইবাদতে কাহিল হয়ে পড়লে বা ঝিমুনি আসলে এটাতে তিনি মাথা ঢুকিয়ে দিতেন, যাতে তিনি ঘুমিয়ে না পড়েন। সেখানে একটি সিন্দুক পেলেন, যার মধ্যে একটি টুকরী পেলেন। যাতে ছিল একটি জামা ও একটি ছোট পাজামা।

আর তাঁর পরিত্যক্ত বস্তুর মধ্যে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পেলেন, তালি দেওয়া একটা জামা ও একটি মোটা জীর্ণশীর্ণ চাদর। এ অবস্থা দেখে খলীফা কেঁদে ফেললেন এবং অভিযোগকারী ভাতিজা ওমর বিন অলীদ বিন আব্দুল মালেক লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আসতাগফিরুল্লাহ' আমি কেবল লোকমুখে শুনেই অভিযোগ করেছিলাম।[৩৩]

৫. সিরিয়া বিজেতা সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধ কৌশল হিসাবে সিরিয়া থেকে আপাততঃ সৈন্যদল পিছিয়ে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে সিরিয়ার খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দকে ডেকে তিনি তাদের নিকট থেকে গৃহীত জিযিয়া কর তাদের ফেরত দিলেন। এতে শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে এসে ক্রন্দন করতে লাগল ও আকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল, আপনারাই আমাদের এলাকা শাসন করুন। আমাদের স্বজাতি খ্রিষ্টান যালেম শাসকদের হাতে আমাদেরকে পুনরায় ন্যস্ত করবেন না। সেনাপতি বললেন, 'আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেহেতু নিতে পারছি না, সেহেতু আপনাদের প্রদত্ত জিযিয়া কর আমরা রাখতে পারি না'।[৩৪] হাক্কুল ইবাদ রক্ষার এই অনুপম দৃষ্টান্ত দেখে তারা বিমোহিত হ'ল। ফলে তখন থেকে আজও সিরিয়া একটি শতভাগ মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত।

৬. সিন্ধু বিজয়ী তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাত্র সাড়ে তিন বছর পর যখন রাজধানী দামেস্ক ফিরে যান, তখন সিন্ধুর অমুসলিম নাগরিকগণ

---

৩৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২১৯।
৩৪. বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ১৩৪।

তাকে রাখার জন্য রাস্তায় কেঁদে গড়াগড়ি দিয়েছিল। পরে মিথ্যা অজুহাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের খবর শুনে তারা অনেকে তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা শুরু করেছিল।[৩৫]

৭. বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীর (১০৬৮-১১১৮হি./১৬৫৮-১৭০৭খৃ.) বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও রাজকোষ থেকে কোন বেতন-ভাতা নিতেন না। নিজ হাতে টুপী সেলাই করে আর কুরআন মজীদ কপি করে যা পেতেন, তাই দিয়ে অতি কষ্টে দিন গুযরান করতেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদে দণ্ডায়মান হয়ে কেঁদে বুক ভাসাতেন।

তাঁর জীবনের অসংখ্য শিক্ষণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ছিল নিম্নরূপ।-

তাঁর একজন মুসলিম সেনাপতি পাঞ্জাব অভিযানকালে একটি গ্রাম অতিক্রম করছিলেন। সে সময় একজন ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী এক যুবতী মেয়েকে দেখে তিনি তার পিতার কাছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পিতা অনন্যোপায় হয়ে বাদশাহ্র শরণাপন্ন হলেন। ওয়াদা অনুযায়ী উক্ত সেনাপতি একমাস পরে বর বেশে উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন ছদ্মবেশী সম্রাট আলমগীর উলঙ্গ তরবারি হাতে স্বয়ং তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে সেনাপতি সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গ্রামবাসী হিন্দুরা ঐদিন থেকে গ্রামের নাম পাল্টিয়ে রাখলো ‘আলমগীর’। যে কামরায় বসে বাদশাহ আওরঙ্গযেব ঐ রাতে এবাদতে রত ছিলেন, ঐ কামরাটি আজও হিন্দুদের নিকট পবিত্র স্থান বলে সম্মানিত হয়ে আছে। কেউ সেখানে জুতা পায়ে প্রবেশ করে না।[৩৬]

এগুলো ছিল পূর্ণ তাক্বওয়ার সাথে যথাযথভাবে হাক্কুল ইবাদ রক্ষার দুনিয়াবী পুরস্কার। এছাড়া আল্লাহ্র নিকটে অঢেল পুরস্কার তো রয়েছেই। ‘ইনসানে কামেল’গণ যালেমদের হাতে লাঞ্ছিত হ’লেও সাধারণ মানুষ এবং আল্লাহ্র নিকটে তারা অশেষ পুরস্কারে ভূষিত হন। জগৎ সংসার সর্বদা তাদেরকেই স্মরণ করে।

---

৩৫. মুহিব্বুদ্দীন আল-খাত্বীব, মা‘আর রা‘ঈলিল আউয়াল (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৫) পৃঃ ২০০; বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ৪৪৬।

৩৬. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস পৃঃ ১৬৬।

উপসংহার :

সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একই আদম-হাওয়ার সন্তান। সকলে এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ প্রেরিত ইলাহী বিধান সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কর। তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী সকল মানুষের নবী। তাঁর প্রেরিত কুরআন ও সুন্নাহ সকল মানুষের কল্যাণে প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান। অতএব সর্বাধিক আল্লাহভীরুতার সাথে সাথে তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে প্রকৃত মানুষ তথা 'ইনসানে কামেল' হওয়া সম্ভব। আর এ কারণেই বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র মমতাপূর্ণ আকুল আহ্বান,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা (প্রকৃত অর্থে) 'মুসলিম' (তথা আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। প্রকৃত মুসলিম যিনি, প্রকৃত 'ইনসানে কামেল' তিনি। যার সর্বোত্তম নমুনা হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*। অতঃপর তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগে যুগে তাঁদের যথার্থ অনুসারী আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ। ঐসব ইনসানে কামেলগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–

'প্রথম দিকের মুহাজির ও আনছারগণ এবং পরবর্তীতে যারা তাদের অনুসারী হয়েছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত সমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তওবাহ ৯/১০০)*। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার প্রিয় 'ইনসানে কামেল'দের অন্তর্ভুক্ত করে নাও- আমীন!!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৪	নবীদের কাহিনী-১-২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৫	নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)]	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬	তাফসীরুল কুরআন- ৩০তম পারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭	ফিরক্বা নাজিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪	জীবন দর্শন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫	দিগদর্শন-১	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৬	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৭	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০	শবেবরাত	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৬	ইনসানে কামেল (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৮	ছবি ও মূর্তি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯	ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩০	হিংসা ও অহংকার	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents